বি জ্ঞা ন - প্র ব ন্ধ

যৌথ মহামারী

করোনা, বায়ুদূষণ ও মানুষের জীবনকাল

সম্পাদিত ও তথ্য-যাচাইকৃত সংস্করণ

অনাবিল সেনগুপ্ত

বিজ্ঞান-লেখক · যুক্তিবাদী কর্মী
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

মূল রচনা ২০২০ · গ্রন্থরূপ ২০২৬

anabilsengupta.com

যৌথ মহামারী

করোনা, বায়ুদূষণ ও মানুষের জীবনকাল

একটি বিজ্ঞান-প্রবন্ধ, ২০২০

অনাবিল সেনগুপ্ত

সম্পাদিত ও তথ্য-যাচাইকৃত সংস্করণ · ২০২৬

© ২০২৬ অনাবিল সেনগুপ্ত

মূল রচনা প্রথম প্রকাশিত: ২০২০ (সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞান-প্রবন্ধ)

প্রকাশক: Anabil Sengupta

ওয়েবসাইট: https://anabilsengupta.com/

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না। সম্পাদকীয় টীকা ও তথ্যসূত্র সংযোজিত হয়েছে ২০২৬ সালের যাচাই-সংস্করণে।

লেখক পরিচিতি

অনাবিল সেনগুপ্ত পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং নেশায় বিজ্ঞান-লেখক ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী। বিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজ নিয়ে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় বাংলার প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে। জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য। কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে “Exposed Emotions” নামে তাঁর একটি জনপ্রিয় উদ্যোগও রয়েছে, যেখানে তিনি বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কারমুক্ত চিন্তার প্রসারে কাজ করেন। যুক্তিবাদী মঞ্চ ও নানা সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত। তাঁর বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলায়। লেখক সম্পর্কে আরও জানা যায় তাঁর ওয়েবসাইটে: anabilsengupta.com।

সূচিপত্র

- ভূমিকা
- অধ্যায় ১ — অমরত্বের স্বপ্ন থেকে গড় আয়ুর ইতিহাস
- অধ্যায় ২ — গড় আয়ু ও কার্বনের বিশ্ব-ভূগোল
- অধ্যায় ৩ — গঙ্গা ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় বায়ু-সংকট
- অধ্যায় ৪ — বায়ুদূষণ: এক নীরব মহামারী
- অধ্যায় ৫ — কোভিড-১৯ ও যুগ্ম মহামারী
- অধ্যায় ৬ — ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও নিউ নর্মাল
- অধ্যায় ৭ — লকডাউন: গ্লোবাল ওয়ার্মিং রোখার পথনির্দেশ
- উপসংহার
- পরিশিষ্ট — তথ্য-যাচাই টীকা প্রসঙ্গে
- তথ্যসূত্র

ভূমিকা

এই বইটির জন্ম একটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধ থেকে। ২০২০ সালে, যখন গোটা পৃথিবী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম ধাক্কায় বিপর্যস্ত, তখন অনাবিল সেনগুপ্ত করোনা ও বায়ুদূষণের “যৌথ মহামারী” এবং তার ছায়ায় মানুষের জীবনকালের সম্ভাব্য অবনমন নিয়ে একটি দীর্ঘ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ লেখেন। সেই একটানা রচনাটিকেই এখানে অধ্যায়ে বিভক্ত করে, ভূমিকা-উপসংহার-পরিশিষ্ট সহযোগে একটি ছোট বইয়ের আকার দেওয়া হয়েছে। সপ্তম ও শেষ অধ্যায়টি লেখকের সমসাময়িক আরেকটি প্রবন্ধ — «ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে রক্ষায় পথ দেখাচ্ছে লকডাউন» — থেকে গৃহীত, যা প্রথম রচনাটির যুক্তিকেই জলবায়ু-প্রশ্নে সম্প্রসারিত করে।

সম্পাদনার সময় লেখকের মূল যুক্তি, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও স্বর অবিকৃত রাখা হয়েছে। কোনো বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়নি, কোনো বিপরীত মত বা নতুন তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়নি। কেবল ছয়টি অধ্যায়ে ভাবনার স্বাভাবিক প্রবাহ অনুসারে লেখাটিকে সাজিয়ে, উপশিরোনাম বসিয়ে এবং বানান ও ছাপার সামান্য ত্রুটি সংশোধন করে পাঠযোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে।

প্রবন্ধটি অজস্র পরিসংখ্যান, প্রতিবেদন ও তারিখের ওপর দাঁড়িয়ে। ২০২৬ সালে এই সংস্করণ তৈরির সময় সেই তথ্যগুলিকে স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে নির্ভরযোগ্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে। যাচাইয়ের ফল—সমর্থন হোক বা সংশোধন—পাঠকের সামনে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে যুক্ত হয়েছে একগুচ্ছ সম্পাদকীয় পাদটীকা এবং বইয়ের শেষে একটি ক্রমসংখ্যাযুক্ত তথ্যসূত্র-তালিকা। মূল লেখাটি ২০২০ সালের তথ্য ও পরিস্থিতির প্রতিফলন; সেই সময়কালকে মাথায় রেখেই পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যায় ১ — অমরত্বের স্বপ্ন থেকে গড় আয়ুর ইতিহাস

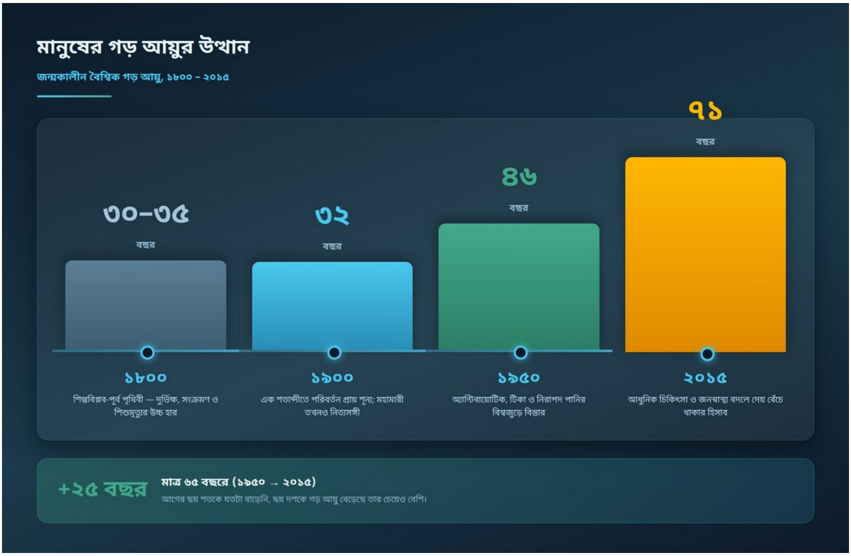

চিত্র ১ — মানুষের গড় আয়ুর উত্থান

অমরত্বের অনন্ত ইচ্ছা

“জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে” — কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের এই চরম সত্যটা লিখেছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের অনবদমিত ইচ্ছে ‘অমরত্ব’। সেই ইচ্ছেটা প্রকাশিত হয়েছে মানুষের প্রতিটি সৃজনশীল সৃষ্টিতেও। যেমন খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতে অমরত্বের জন্য ‘অমৃত রসে’র সন্ধান, যা সমুদ্রমন্থনের মাধ্যমে

পাওয়া যায় এবং তা লাভ করার জন্য দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। অসুরদের ব্যর্থতা যেন মানুষের মরণশীলতার শিক্ষা। অমরত্ব হল অনন্ত জীবন বা চিরকালের জন্য বেঁচে থাকার ক্ষমতা। যেকোনো প্রাণীর জৈবিক কাঠামোর কিছু সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে জয় করার যৎপরোনাস্তি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মানুষেরা। প্রকৃতিগতভাবে অন্তত এক প্রজাতির জেলিফিশ রয়েছে যার নাম 'টুরিটসিস ডোরনি', যাকে সম্ভবত অমর হিসেবে ধরা হয়।

মৃত্যুর নানা রূপ

তবে ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার উৎকর্ষতার সঙ্গে বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। মানুষের জীবদ্দশার একটা সীমারেখা রয়েছে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। কেউ বার্ধক্যজনিত কারণে, কেউ রোগে ভুগে, কেউবা অপমৃত্যুর শিকার হচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণেও হাজার হাজার মানুষকে অকালেই প্রাণ দিতে হচ্ছে। আবার অনেক দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বঞ্চনার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে।

গত শতকেই ভারতসহ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলো অনুন্নত। যার ফলে তখন এক কলেরা রোগই গ্রামের পর গ্রামকে জনশূন্য করে দিতো। এই কলেরায় মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের মৃত্যুর

হার সবচেয়ে বেশি ছিল। জানা যায়, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপিয়ানদের উপর সে সময় কলেরা সে ভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। মূলত বন্যার পরই জলবাহিত পেটের অসুখে সে সময় প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গড় আয়ুর অগ্রগতি

১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র ৩৫ বছর।[1] আপনি যদি উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে হয়তো আপনি ৩০ থেকে ৪০ বছর বেঁচে থাকতেন। কিন্তু যখন থেকে ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করার আগে-পরে নিয়মিতভাবে হাত বৈজ্ঞানিকভাবে পরিষ্কার করা শুরু করলো, তখন থেকে মানুষের গড় আয়ু বাড়তে শুরু করলো। যেমন পেনিসিলিন আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এবং হাসপাতালগুলোতে ব্যাপক স্যানিটেশনের সুব্যবস্থা থাকার কারণে মানুষের গড় আয়ুর হার আরো বেড়ে গিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় চিকিৎসা

---

[1] সম্পাদকীয় টীকা: ঊনবিংশ শতক শুরুর আগে বিশ্বের গড় প্রত্যাশিত আয়ু সাধারণত ~৩০ বছরের কাছাকাছি ধরা হয় (Our World in Data); কিছু হিসেবে তা ~৩৫ পর্যন্ত ওঠে। ফলে “৩৫ বছর” পরিসরের উচ্চ প্রান্তে; “~৩০–৩৫ বছর” বলাই নিরাপদ। সূত্র: Our World in Data, https://ourworldindata.org/life-expectancy-globally

ব্যবস্থায় বিরাট উন্নতি ঘটেছে। অধিকাংশ মানুষকেই চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে আনা গেছে। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার কারণে পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুহার কমার পাশাপাশি বেড়েছে গড় আয়ু।

১৯৫০ সালে বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৬ বছর। কিন্তু গত ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেটি দাঁড়িয়েছে ৭১ বছরে। অর্থাৎ গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ বছর!

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে

২০২০ সালে দাঁড়িয়ে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জনসংখ্যা প্রায় ৭৬০ কোটির মতো।[2] যা ১৯১৮ সালে ছিলো বর্তমানের জনসংখ্যার মাত্র ২০-২৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১৭৫ থেকে ২০০ কোটির মতো। এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ মানুষের গড় জীবনকালের উন্নতি।

---

[2] সম্পাদকীয় টীকা: ২০২০ সালের মাঝামাঝি বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮০–৭৮৪ কোটি (~৭.৮ বিলিয়ন)। “৭৬০ কোটি” সংখ্যাটি বরং ২০১৮ সালের কাছাকাছি; ২০২০-এর জন্য “~৭৮০ কোটি” অধিকতর সঠিক। সূত্র: Worldometers, https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

অধ্যায় ২ — গড় আয়ু ও কার্বনের বিশ্ব-ভূগোল

মহাদেশ ধরে গড় আয়ু

বর্তমানে উত্তর আমেরিকার মানুষের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি। এই অঞ্চলের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৮০ বছর। এরপরই রয়েছে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা। এই দুই মহাদেশের অধিবাসীদের গড় আয়ু যথাক্রমে ৭৭.৭ বছর ও ৭৫.১ বছর। তারপরের অবস্থানে রয়েছে এশিয়া মহাদেশ। এশিয়ার দেশগুলোতে বসবাসরত একজন মানুষের গড় আয়ু ৭২.৪ বছর। আর সবার নিচে রয়েছে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল। এখানকার মানুষদের গড় জীবনকাল ৫৯.৩ বছর।

ইউএনডিপি ২০১৯: দেশ ধরে হিসেব

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউ.এন.ডি.পি.) ২০১৯-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের গড় আয়ু ৬৯.৪ বছর (পুরুষ ৭০.৭ এবং মহিলা ৬৮.২)। ১৮৬টি দেশের মধ্যে ১৩০তম স্থানে।[3] অনেকটাই নিচে উন্নত দেশগুলোর থেকে।

---

[3] সম্পাদকীয় টীকা: ইউএনডিপি-র ২০১৯ Human Development Report-এ ভারতের মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) অনুযায়ী অবস্থান ছিল ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১২৯তম—প্রবন্ধের “১৮৬টি দেশের মধ্যে ১৩০তম”-এর সঙ্গে মেলে

প্রতিবেশী দেশগুলো ভারতের থেকে গড় আয়ুতে কিছুটা হলেও এগিয়ে; যেমন বাংলাদেশের গড় আয়ু ৭২.৮ বছর, ১০৮তম দেশ; ৭১.৫ বছর গড় আয়ুতে ভুটান ১১৫তম; নেপালের গড় আয়ু ৭০.৫ বছর ও ১২৪তম স্থানে। তবে পাকিস্তানের অবস্থা আমাদের থেকেও খারাপ—সেখানে গড় আয়ু ৬৭.১ বছর, পৃথিবীতে ১৪০তম স্থানে। প্রথম স্থানে হংকং-এর গড় আয়ু ৮৪.৭ এবং দ্বিতীয় জাপানের ৮৪.৫ বছর। ৩৮তম স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় আয়ু ৭৮.৯ বছর।

দেশের মানুষের গড় আয়ু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়ার পেছনে অবশ্যম্ভাবীভাবেই রয়েছে দেশগুলোতে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তাই বিবিসির ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট-২০১৭-এর ওপরের দিকের দেশের গড় আয়ু সর্বোচ্চ। শক্তিশালী ও বর্ধনশীল অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবায় প্রচুর সুযোগ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কম, পুষ্টিসম্পন্ন খাবার, প্রবল মানসিক

না। ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির গড় আয়ুর *মানগুলি* (৬৯.৪, ৭২.৮, ৭০.৫, ৬৭.১ ইত্যাদি) HDR 2019-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু এখানে উদ্ধৃত *ক্রম-সংখ্যা* (১০৮, ১১৫, ১২৪ ইত্যাদি) HDI তালিকার সঙ্গে মেলে না; সম্ভবত এগুলি পৃথক কোনো গড়-আয়ু-ভিত্তিক তালিকার অবস্থান। সূত্র: UN India / HDR 2019, https://india.un.org/en/163171-india-makes-modest-progress-2019-human-development-report

চাপের অনুপস্থিতি, আর্থসামাজিক উন্নয়নে অগ্রগতি এবং স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্যের অনুপস্থিতি—এইসব কারণ এর পেছনে রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে ঐসকল দেশে বায়ুদূষণের মাত্রাও অনেক কম।

সবচেয়ে কম আয়ুর দেশ

অন্যদিকে ১৮৬তম স্থানে আফ্রিকার সেন্ট্রাল রিপাবলিক অঞ্চলের মানুষের গড় জীবনকাল ৫২.৮ বছর। ১৮৪তম স্থানে আফ্রিকার চাদের গড় আয়ু ৫৪ বছর। ‘হু’ রিপোর্ট অনুযায়ী, যে রাষ্ট্রসমূহের সামগ্রিক আয়ু সর্বনিম্ন সেগুলো হল সিয়েরা লিওন, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, গিনি-বিসাউ, লেসোথো, সোমালিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, অ্যাঙ্গোলা, চাদ, মালি, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন এবং মোজাম্বিক। এর মূল কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপুষ্টি। প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত এই দেশগুলো। বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে প্রতিবেশী দেশগুলোর হামলা। এছাড়াও এইডস মহামারীর পরিমাণ এখানে দিনকে দিন বাড়ছে। এই স্বল্প গড় আয়ুর পেছনে দূষিত পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা, রাসায়নিক ব্যবহার বৃদ্ধিসহ আরও অনেক কারণ বিদ্যমান। দেশগুলোর মানবসম্পদ রক্ষার্থে জাতিসংঘ আশপাশের রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

চীন, কার্বন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

ভারতের সাথে সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে জড়িত প্রতিবেশী দেশ রিপাবলিক চায়নার গড় আয়ু ৭৬.৭ বছর, পৃথিবীতে ৫৯তম স্থানে। সম্প্রতি চীনে প্রায় ২৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমেছে। ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বায়ুদূষণের হার কমে গিয়েছিল। দেশটি নিয়ন্ত্রণ করেছে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী পরিবহন ব্যবস্থাকে। আবার ২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনের উহান শহর থেকেই বিশ্বে প্রাদুর্ভাব ঘটে করোনা ভাইরাসের মহামারীর। সাম্প্রতিক চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং ঘোষণা করলেন, চীনে কার্বন নিঃসরণ সর্বোচ্চ হবে ২০৩০ সালের মধ্যে; এবং ২০৬০-এর মধ্যে চীন কার্বন-নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন।[4] বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতি এবং আর্থিক মন্দার জন্যই কি এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন?

---

[4] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। জি জিনপিং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ঘোষণা করেন—চীন ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের শীর্ষে পৌঁছবে এবং ২০৬০-এর মধ্যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবে। সূত্র: Climate Home News, https://www.climatechangenews.com/2020/09/22/xi-jinping-china-will-achieve-carbon-neutrality-2060/

মাথাপিছু কার্বনের বিশ্ব-মানচিত্র

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিতর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, রাশিয়া, ভারত ও চীনের মাধ্যমেই বাতাসে দূষণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। বায়ুদূষণ রোধে আমেরিকা চেষ্টা করলেও এই তিন দেশকে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না বলেও অভিযোগ মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও বা হু), ইউনিসেফ এবং দ্য ল্যানসেট গঠিত একটি কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের দিক থেকে দায়ীদের মধ্যে শীর্ষে মধ্যপ্রাচ্য আর শিল্পোন্নত দেশগুলো। কাতার— মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির মানুষ বছরে গড়ে ৪৯ টন কার্বন ছড়ানোর জন্য দায়ী। ২০৩০ সালের বৈশ্বিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তাদের কার্বন ব্যবহার ১৭১৬ ভাগ বেশি। মাথাপিছু কার্বন ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অষ্টম। দেশটির মানুষ গড়ে ১৬ টন কার্বন ব্যবহার করে। এসডিজি লক্ষ্য অর্জন করতে হলে তা ৫০০ ভাগ হ্রাস করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের উপরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চায়নার মানুষ গড়ে ৭.০৫ টন এবং রাশিয়ার মানুষ গড়ে ১১.৭৪ টন কার্বন নিঃসরণ করে।

ভারতের মানুষের গড় কার্বন নিঃসরণ এদেশগুলোর থেকে কম হলেও, বার্ষিক মোট কার্বন নিঃসরণে চায়না ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তৃতীয় স্থানে। চতুর্থ

স্থানে রাশিয়া। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মাথাপিছু সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ নেপাল। তাদের অবস্থান ২৬তম। অন্যদিকে এই অঞ্চলে মাথাপিছু সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশ ভারত—মানুষ গড়ে এক দশমিক আট-চার (১.৮৪) টন কার্বন ছড়ানোর জন্য দায়ী। তবে মাত্রাটি এখনও এসডিজি লক্ষ্যের চেয়ে বেশ খানিকটা কম। বাংলাদেশ ৩৯তম—বছরে মাথাপিছু দশমিক ৫৩ (০.৫৩) টন কার্বন ব্যবহার করে এই দেশের মানুষ, এসডিজিতে বেঁধে দেওয়া মাত্রার চেয়েও যা আশি ভাগ কম। বিশ্বের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব দেশগুলোর অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশে। সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ বুরুন্ডি—মাথাপিছু মাত্র দশমিক শূন্য-পাঁচ (০.০৫) টন। একই পরিসংখ্যান চাদ কিংবা সোমালিয়ার ক্ষেত্রেও। সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণকারী ১৯টি দেশই এই মহাদেশের।

অধ্যায় ৩ — গঙ্গা ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় বায়ু-সংকট

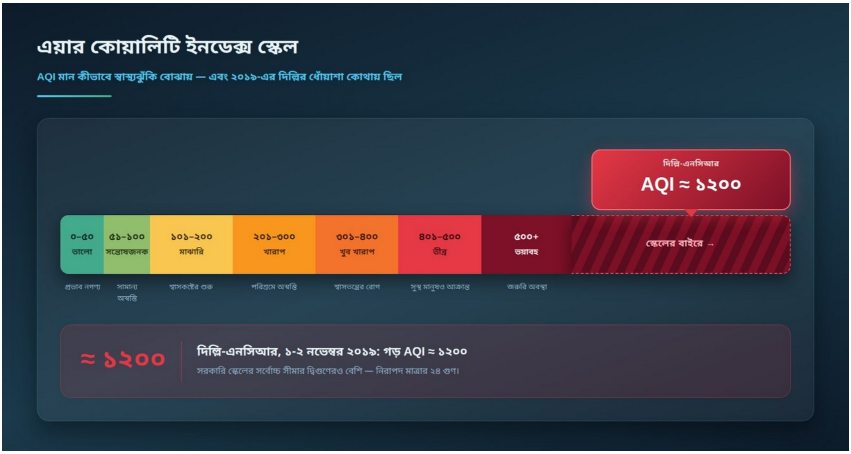

চিত্র ২ — এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স স্কেল

সভ্যতার সমভূমি

গঙ্গা নদী শুধুমাত্র ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাস নয়। ভারতের ইতিহাস বলতে মূলত সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির তটে গড়ে ওঠা মানববসতির ইতিহাসকেই বোঝানো হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গেই প্রায় সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে মহাজনপদ নামে পরিচিত ১৬টি প্রধান প্রধান রাজ্য-তথা-জনবসতির উত্থান ঘটে। বর্তমানে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটি গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জন-অধ্যুষিত

এলাকার একটি। এখানে প্রায় ৯০ কোটি লোক বাস করে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ।

দূষিত গঙ্গা

সেই ঐতিহ্যবাহী গঙ্গা নদী বিশ্বের পাঁচটি সবচেয়ে দূষিত নদীর একটি। বারাণসীর কাছে এই নদীতে ফেকাল কলিফর্মের পরিমাণ ভারত সরকার নির্ধারিত সীমার চেয়ে একশো গুণ বেশি। গঙ্গাদূষণ শুধুমাত্র গঙ্গাতীরে বসবাসকারী কয়েক কোটি ভারতীয়েরই ক্ষতি করছে না, ক্ষতি করছে ১৪০টি মাছের প্রজাতি, ৯০টি উভচর প্রাণীর প্রজাতি ও ভারতের জাতীয় জলচর প্রাণী গাঙ্গেয় শুশুকেরও। গঙ্গাদূষণ রোধে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতি, প্রযুক্তিগত অদক্ষতা, সুষ্ঠু পরিবেশ পরিকল্পনার অভাব, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলির অসহযোগিতার কারণে এই প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দে যদি গঙ্গা নদী দূষণমুক্ত হয়, সেই আশায় বুক বেঁধেছে অনেকেই। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার এই সমৃদ্ধ ও সর্বোচ্চ জনবহুল অঞ্চলের আকাশে কালো ছায়ার মতো আরেকটা বিপদ এসে হাজির হয়েছে বায়ুদূষণ রূপে।

সাত রাজ্যের সাত বছর

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি) পরিচালিত এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের তথ্য-বিশ্লেষণ দেখিয়েছে, বায়ুদূষণে বিশ্বব্যাপী মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৩ বছর হ্রাস পেয়েছে। ভবিষ্যতে গাঙ্গেয় উপত্যকার সাত রাজ্য—পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড় আয়ু কমে যেতে পারে সাত বছর।[5] ফলে, দেশের প্রায় ৪৮ কোটি মানুষের জীবনে এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের গড় আয়ু কমে যাবে সাত বছর।

---

[5] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। University of Chicago-র EPIC পরিচালিত Air Quality Life Index (AQLI)-এর ২০১৯ সালের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির বাসিন্দারা বায়ুদূষণের কারণে গড়ে প্রায় ৭ বছর আয়ু হারাতে পারেন, যা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশকে প্রভাবিত করে। সূত্র: EPIC, University of Chicago, https://epic.uchicago.edu/news/bad-air-cutting-lives-short-by-7-years-in-hindi-heartland-study

এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ও দিল্লির দুর্দশা

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানীর মধ্যে সবার উপরে দিল্লি। বর্তমানে দিল্লি ও তার আশেপাশের রাজ্যের দূষণ পরিস্থিতির জন্য এটি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানী। তারপরে রয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা। আমাদের কলকাতার বায়ুদূষণের প্রকোপও খুবই উদ্বেগজনক। বর্তমানে দিল্লির আশেপাশের রাজ্যের দূষণের পরিস্থিতি এতটাই জটিল আকার ধারণ করেছে যে 'হেলথ ইমারজেন্সি' ঘোষণা করেছিলো সুপ্রিম কোর্ট।

সাধারণত 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' যদি শূন্য থেকে ৫০ পর্যন্ত থাকে, তবে তা ভালো। ৫১-১০০ ঠিকঠাক। ১০১-২০০ হলে মোটামুটি পর্যায়ে। ২০১-৩০০ খারাপ। ৩০১-৪০০ খুব খারাপ। ৪০১-৫০০ হলে মারাত্মক। তার বেশি হলে 'অতি মারাত্মক'। গত ২০১৯ সালের ১ ও ২ নভেম্বর দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল গড়ে ১২০০! সহজেই অনুমেয়, পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে কয়েক দিন পরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়ে তা 'অতি মারাত্মক' থেকে 'মারাত্মক'-এ নেমে আসে।

অধ্যায় ৪ — বায়ুদূষণ: এক নীরব মহামারী

চিত্র ৩ — বায়ুদূষণ: এক নীরব মহামারী

অস্বীকার বনাম বিজ্ঞান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ‘হু’ জানিয়েছে, ভারতে অকাল মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী এই দূষণ। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন, দূষণ ও মানুষের আয়ু কমে যাওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে, তা আদৌ কোনো ভারতীয় সমীক্ষা দেখাতে পারেনি। মন্ত্রী বলেন, ‘যে সব সমীক্ষা ভারতে হয়েছে সেগুলি দূষণ ও মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার

মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেখাতে পারেনি। তাই মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি না করাই ভাল।’

পরিবেশ মন্ত্রীর এ দাবি প্রসঙ্গে ‘হু’-এর ডিরেক্টর বলেন, ‘তীব্র বায়ুদূষণ যে মানুষের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে তার জোরালো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। এরপরও আমরা সরকারের কাছে আর্জি জানাব দূষণ হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, কারণ এই বায়ুদূষণ ভয়ানকভাবে দেশের নাগরিকের শরীরের ওপর প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে সেইসব শহরে যেখানে’‘হু’‘-এর প্রস্তাবিত নির্দেশিকার চেয়েও বায়ুদূষণের পরিমাণ উচ্চতর।’

মৃত্যুর পরিসংখ্যান

‘দ্য ল্যানসেট জার্নালে’ প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, ২০১৭ সালে আটজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু বায়ুদূষণের ফলে হচ্ছে। এই সমীক্ষায় এও দেখা গিয়েছে যে বিশ্বের জনসংখ্যায় ভারতে সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ক্ষতির মধ্যে সর্বাধিক। ২০১৭

সালে শুধুমাত্র বায়ুদূষণের কারণেই দেশে ১২.৪ লক্ষ মৃত্যু হয়েছে।[6] বিষযুক্ত বায়ুই দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আগের বছরও দিল্লির বায়ুদূষণ ঘুম কেড়েছিল বাসিন্দাদের। দিওয়ালির পর থেকেই দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে শুরু করে দেয়। শ্বাস নেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে দিল্লিবাসীর কাছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে ভর্ৎসিত হয় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। 'হু' ডিরেক্টর বলেন, 'সরকার যত শীঘ্র পদক্ষেপ নেবে তত তাড়াতাড়ি মানুষ মৃত্যুর ফাঁদ থেকে রেহাই পাবে। দেরি করলে আরও অনেকে এই বায়ুদূষণের শিকার হতে পারে।'

---

[6] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। The Lancet / GBD India State-Level সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৭ সালে ভারতে বায়ুদূষণ-সংশ্লিষ্ট মৃত্যু প্রায় ১২.৪ লক্ষ (~1.24 million), এবং দেশে প্রতি আটজনের একজনের মৃত্যুতে বায়ুদূষণের অবদান ছিল। সূত্র: The Lancet Planetary Health, https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30261-4/fulltext

বায়ুদূষণের কারণে সারাবিশ্বে অকালে মারা যাচ্ছে প্রায় ৮৮ লাখ মানুষ।[7] দিল্লির গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) পরিচালিত গবেষণায় দেখিয়েছে, শুধুমাত্র ২০১০ সালেই ৬,২০,০০০ অকাল মৃত্যু বা শিশুমৃত্যুর ঘটনা ভারতে ঘটেছে, যার পিছনে অন্যতম কারণ হলো বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব।

রোগের বিশ্ব-বোঝা

২০১৬ সালে ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন (আইএইচএমই)-এর ‘গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজ’ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রোগে যতজন মৃত্যুবরণ করেছেন তার মধ্যে ১৬ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে হৃদরোগ। এই রোগে শতকরা ১৪.৩ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়।[8] এর পরের তিনটি অবস্থানে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ (সিওপিডি), ডায়াবেটিস ও শ্বাসতন্ত্রের

---

[7] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। বিশ্বব্যাপী বছরে প্রায় ৮৮ লক্ষ (৮.৮ মিলিয়ন) অকাল মৃত্যুর হিসেবটি *Cardiovascular Research* (২০২০, ২০১৫ সালের উপাত্তভিত্তিক) থেকে আসা বহুল-উদ্ধৃত পরিসংখ্যান; পুরোনো কিছু WHO হিসেবে সংখ্যাটি ~৭০ লক্ষ। সূত্র: Lelieveld et al., Cardiovascular Research, https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200302200734.htm

নিচের অংশের সংক্রমণ (লোয়ার রেসপিরেটরি ইনফেকশন)। সর্বাধিক মানুষ যে রোগগুলোতে মারা যাচ্ছে, সেগুলো হওয়ার পেছনে উচ্চ রক্তচাপ, বায়ুদূষণ, বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র বস্তুকণা, রক্তে অতিরিক্ত শর্করা এবং ধূমপান দায়ী। বিশেষ করে সেরিব্রোভাসকুলার ডিজিজ (স্ট্রোক) হওয়ার পেছনে সবচেয়ে দায়ী ধূমপানসহ সামগ্রিকভাবে বায়ুদূষণ। এর জন্য ধূমপানসহ বায়ুদূষণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা জরুরি। সচেতনতাও প্রয়োজন। যক্ষ্মা, এইচআইভি বা এইডস ও ধূমপানের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আয়ু কমানোতে বেশি প্রভাব ফেলে বায়ুদূষণ।

দক্ষিণ এশিয়ার দূষিত আকাশ

এই দূষণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ বাস করে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ—বাংলাদেশ,

---

[8] সম্পাদকীয় টীকা: বৈশ্বিক GBD উপাত্তে সাধারণত হৃদরোগ (ischemic heart disease, ~১৬%) প্রথম এবং স্ট্রোক (~১১%) দ্বিতীয় কারণ—অর্থাৎ প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত। এখানকার ১৬%/১৪.৩% বিন্যাস সম্ভবত ভারত-নির্দিষ্ট বা স্থানান্তরিত উপাত্ত; ঝুঁকি-উপাদানের তালিকা (উচ্চ রক্তচাপ, বায়ুদূষণ, বস্তুকণা, রক্তে শর্করা, ধূমপান) যথাযথ। সূত্র: IHME, Global Burden of Disease, https://ourworldindata.org/causes-of-death

ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তানে—যা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালেই প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, পৃথিবীর সবথেকে বেশি দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টিই আছে ভারতে। সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে ‘হু’ জানিয়েছে, সবথেকে দূষিত শহর হলো উত্তর প্রদেশের কানপুর। সেখানে শূন্যে ভাসমান কণার পরিমাণ নিরাপদ স্তরের থেকে প্রায় ১৭ গুণ বেশি।[9] দুই দশক আগের তুলনায় এখন দূষণের মাত্রা ৪৪ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় এসব দেশে বসবাসরত মানুষের গড় আয়ু পাঁচ বছর কমেছে।

‘মহামারী’ নামে বায়ুদূষণ

এখন যেন বায়ুদূষণের বিশ্ব-মহামারী হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল ‘কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চে’ প্রকাশিত একটি গবেষণায় বায়ুদূষণকে ‘মহামারী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তেল, গ্যাস, কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে

---

[9] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। WHO-র নগর বায়ুমান তথ্যভান্ডার অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের কানপুরকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল (PM2.5 WHO নির্দেশিকার প্রায় ১৭ গুণ); ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বিশ্বের ২০টি দূষিততম শহরের ১৩টিই ছিল ভারতে। সূত্র: BBC / WHO, https://feeds.bbci.co.uk/news/world-asia-india-43972155

উৎপন্ন দূষণ সৃষ্টিকারী কণার প্রভাব মানুষের ফুসফুসে প্রায় এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। জনস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর। পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে এই ক্ষতি কমানো সম্ভব।

মহামারীর তুলনায় বায়ুদূষণেই বেশি মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। ম্যালেরিয়ার তুলনায় ১৯ গুণ এবং এইডসের তুলনায় প্রায় নয় গুণ বেশি মানুষ বায়ুদূষণের কারণে অকালে মারা যাচ্ছেন।[10] বায়ুদূষণ থেকে কেবল ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে প্রায় ছয় শতাংশ মানুষ। এর প্রভাবে ফুসফুসের অন্যান্য রোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। বায়ুদূষণের কারণে চীনে ৪.১, ভারতে ৩.৯ এবং পাকিস্তানে ৩.৮ বছর গড় আয়ু কমেছে। 'প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অকাল মৃত্যুর জন্য মূলত

[10] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। *Cardiovascular Research*-এ প্রকাশিত Lelieveld et al. (২০২০) গবেষণা অনুযায়ী বায়ুদূষণ অকাল মৃত্যুর কারণ হিসেবে ম্যালেরিয়াকে ~১৯ গুণ এবং এইচআইভি/এইডসকে ~৯ গুণ ছাড়িয়ে যায়; জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃসরণ বন্ধ করলে বছরে ~৫৫ লক্ষ মৃত্যু এড়ানো যেত। সূত্র: Newsweek / Cardiovascular Research, https://www.newsweek.com/air-pollution-pandemic-smoking-malaria-1490046

মানবসৃষ্ট দূষণই দায়ী। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বছরে প্রায় ৫৫ লাখ মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।'

বায়ুদূষণের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসমূহ জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলে। বায়ুদূষণের প্রভাব একেক দেশে একেকরকম হয়। আফ্রিকার চাদে বায়ুদূষণের কারণে গড় আয়ু কমেছে ৭ বছরের বেশি। আবার কলম্বিয়াতে কমেছে ৪ মাসের কিছু বেশি সময়। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ অকাল মৃত্যুর কারণ দূষণ, যা মূলত মানুষের সৃষ্টি। এখুনি দেশের নীতিনির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞদের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল জীবাশ্ম জ্বালানি নির্গমন যদি শূন্যে নামিয়ে আনা যেত, তাহলে মানুষের গড় আয়ু অন্তত এক বছর বাড়ানো যেত।

পৃথিবীতে নানা ধরনের রোগ, মহামারী এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা মানুষের গড় আয়ুর ওপরে প্রভাব ফেলেছে। একটা সময়, এখনকার তুলনায় সংক্রামক রোগব্যাধির এক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা ছিল। ১৯৯০ সালে প্রতি তিনজনের একজনের মৃত্যুর কারণ ছিল সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ। ২০১৭ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে প্রতি পাঁচজনে একজনে।

অধ্যায় ৫ — কোভিড-১৯ ও যুগ্ম মহামারী

চিত্র ৪ — বায়ুদূষণে হারানো জীবন-বছর

মরার উপর খাঁড়ার ঘা

বায়ুদূষণ দ্বারা সৃষ্ট রোগের সঙ্গে সাদৃশ্যকারী এবং ‘মরার উপর খাঁড়ার ঘা’-য়ের মতো মানব শরীরে এখন হানা দিয়েছে ‘গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রীয় রোগলক্ষণসমষ্টি সৃষ্টিকারী’ (সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) করোনাভাইরাস বা সংক্ষেপে সার্স-কোভ-২ নামক আরএনএ ভাইরাস। এটি মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়ে একটি রোগের সৃষ্টি করে, যার নাম

কোভিড-১৯। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রোগে বেশি অসহায় করেছে প্রতি ছ’জন আক্রান্তের মধ্যে একজনকে, যাদের আগের থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত গুরুতর অবস্থা ছিলো। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এবং যারা বয়স্ক (বিশেষত যাদের উচ্চ-রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা বা ডায়াবেটিস রয়েছে) তাদের এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এইসব রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বায়ুদূষণ! আমাদের মানবসভ্যতা ঠিক যেন ঘূর্ণাবর্তের পাঁকে আটকে গিয়েছে!

মহামারী ঘোষণা ও সংক্রমণের বিস্তার

এই ভাইরাসঘটিত রোগটিকে ২০২০ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য সতর্কতা’ এবং ১১ই মার্চ ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস রোগ ২০১৯ (কোভিড-১৯) কে ‘বৈশ্বিক মহামারী’ ঘোষণা করে।[11] বর্তমানে এই ভাইরাস পৃথিবীর ২১৭টি দেশে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষকে সংক্রমিত করেছে। এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় বারো লক্ষ মানুষের।

---

[11] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩০ জানুয়ারি ২০২০-এ কোভিড-১৯ কে ‘আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা’ (PHEIC) এবং ১১ মার্চ ২০২০-এ ‘বৈশ্বিক মহামারী’ ঘোষণা করে—উভয় তারিখই সঠিক। সূত্র: WHO / Worldometers, https://www.worldometers.info/coronavirus/

করোনাভাইরাসে মৃতদের মধ্যে ৮৫ শতাংশেরই বয়স ৪৫ বছরের ওপরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসের দাপট সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। তারপরেই ভারতেও উত্তরোত্তর এর প্রভাব বেড়েই চলেছে —প্রায় দেড় লক্ষ মতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে সুস্থতার হার এখন প্রায় ৮২ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ২০২১ সালের আগে সার্বিকভাবে টিকাকরণের সম্ভাবনা নেই। এই মহামারীর প্রভাবে মানবসভ্যতার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোথায় পৌঁছাবে এখুনি বলা অসম্ভব।

লকডাউন, অর্থনীতি ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বেশিরভাগ দেশই লকডাউনের পথ বেছে নিয়েছে। জানা গেছে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩৫০ কোটিরও বেশি মানুষ লকডাউনে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ২১৭টি দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ৯০টি দেশ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে লকডাউন প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এই লকডাউনে পুরো অর্থনীতি অচল হয়ে পড়েছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা সতর্কবাণী দিয়েছে, অর্থনীতি এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের অন্তত তিন কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে। লকডাউনের ফলে কোথাও কোথাও ৫-৬ মাসের বেশি সময় ধরে ঘরবন্দি

মানুষ। চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে তাদের খাদ্য ব্যবস্থা। বিমান, রেলসহ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ থাকায় সরবরাহও থমকে গেছে। এ অবস্থায় অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে কোটি কোটি মানুষের।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, করোনাভাইরাস সম্ভবত কোটি কোটি মানুষের জন্য একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বিশ্বজুড়ে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবাও এইসময়ে ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত। সাধারণ মানুষের করোনা ব্যতীত অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা কিংবা সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপকহারে অবনমন চলছে, যা পৃথিবীর সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের গড় জীবনকালকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট!

দুটি গবেষণাপত্রের সতর্কবার্তা

সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটো গবেষণাপত্র উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে পরিতুষ্ট করেছে। প্রথমটি, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে গবেষণায় পিএলওএস ওয়ান (PLOS One) জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে যে, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের আয়ুতে প্রভাব ফেলতে চলেছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে গড়

বয়স ১০ শতাংশ কমে যেতে পারে।[12] এই গবেষণায় একপ্রকার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে যে, যদি স্বাস্থ্যসেবা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সংস্কার না করা হয় তবে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক হবে।

দ্বিতীয়টি, স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার রিপোর্ট (‘সোগা’) উদ্বেগজনক খবর জানিয়েছে—শুধু বায়ুদূষণের জন্যই গত বছর ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৬ লক্ষ

---

[12] সম্পাদকীয় টীকা: PLOS One-এ প্রকাশিত গবেষণাটি (“Assessing the potential impact of COVID-19 on life expectancy”, 2020) সংক্রমণের *প্রাদুর্ভাব-হারের* (prevalence) কথা বলেছে, আয়ুর ১০% হ্রাসের নয়। এতে দেখানো হয়েছে যে ১০% সংক্রমণ-প্রাদুর্ভাবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মতো উচ্চ-আয়ুর অঞ্চলে গড় আয়ু “এক বছরের কিছু বেশি” কমতে পারে; ৩–৯ বছর হ্রাস কেবল ~৫০% প্রাদুর্ভাবে। অর্থাৎ “গড় বয়স ১০ শতাংশ কমে যেতে পারে” ব্যাখ্যাটি গবেষণার দাবির সঙ্গে মেলে না। সূত্র: PLOS One, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238678

৬৭ হাজার মানুষের।[13] প্রকাশিত ওই রিপোর্ট বলছে, ভারতে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুতে সবচেয়ে বড় কারণ হয়েছে বায়ুদূষণ।

---

[13] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। State of Global Air (Health Effects Institute / Boston College, ২০১৯ সালের GBD উপাত্তভিত্তিক) রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বায়ুদূষণ-সংশ্লিষ্ট মৃত্যু ছিল প্রায় ১৬,৬৭,০০০ (~১.৬৭ মিলিয়ন)। সূত্র: State of Global Air / The Lancet Planetary Health, https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30298-9/fulltext

অধ্যায় ৬ — ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও নিউ নর্মাল

স্প্যানিশ ফ্লু: ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

অনেকে বলছেন, ইতিহাস যেন তার পুনরাবৃত্তি করেছে! তার ফলেই ১৯১৮ সালে যেমন বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল স্প্যানিশ ফ্লু-এর ধাক্কায়, তেমনই ২০২০ সালে কাঁপছে কোভিড-১৯-এর প্রকোপে। স্প্যানিশ ফ্লু ১৯১৮ সালের বসন্তকালে ইওরোপের জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এবং আমেরিকাতে ছড়িয়েছিল। স্প্যানিশ ফ্লু এরপরে মারণ ভাইরাস ('এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামে চিহ্নিত)-এর আকারে সারা বিশ্বকে গ্রাস করে নেয়। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চলা ওই মহামারীতেই সারা বিশ্বের প্রায় ২ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।[14] এই মারণ

[14] সম্পাদকীয় টীকা: "২ কোটি" সংখ্যাটি একটি পুরোনো, নিম্নপ্রান্তিক অনুমান। আধুনিক পণ্ডিতদের সর্বসম্মত হিসেব অনুযায়ী ১৯১৮–১৯ স্প্যানিশ ফ্লুতে মৃত্যু হয় অন্তত ~৫ কোটি (৫০ মিলিয়ন), কিছু অনুমানে তা ~১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) পর্যন্ত। উল্লেখ্য, একা ভারতেই মৃত্যু হয় প্রায় ১.২ কোটি—যা প্রবন্ধের ২ কোটির বিশ্ব-মোটের সঙ্গে অন্তর্গতভাবেই অসঙ্গতিপূর্ণ। সূত্র: Our World in Data, https://ourworldindata.org/spanish-flu-largest-influenza-pandemic-in-history

ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রায় ৫০ কোটি মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরম অব্যবস্থার সময়ই ছড়িয়েছিল এই মহামারী।

বিশেষজ্ঞের মতে, এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সাইটোকাইন স্টর্মকে বাড়িয়ে যুবক-যুবতীদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছিলো। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের এটি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বযুদ্ধের সময় হাসপাতাল, সেনাশিবির বা জনবসতির ঘিঞ্জি, অপরিচ্ছন্ন পরিস্থিতি, অপুষ্টিজনিত একাধিক কারণে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা মারণ স্প্যানিশ ফ্লু হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মেডিসিন লাইব্রেরির (এন.সি.বি.আই.) তথ্য অনুযায়ী, স্প্যানিশ ফ্লু-এর প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ছাউনিতে মৃত্যুহার প্রায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। মৃত্যুর হার ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সাদা চামড়ার মানুষদের ৯.৬ শতাংশ এবং ভারতীয়দের ২১.৯ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর প্রভাব এত মারাত্মক ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ১০ বছর কমে যায়। গোটা বিশ্বেও মানুষের গড় আয়ু এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যায়।

আজকের কোভিড-১৯-এর মতোই স্প্যানিশ ফ্লু-ও ছিল নিঃশ্বাসজনিত ভাইরাস। তাই তার থেকে বাঁচতে তৎকালীন বিশ্বেও একইরকম সুরক্ষা বিধি নেওয়া হয়েছিল। যেমন রোগী থেকে চিকিৎসক, সাফাইকর্মী থেকে পুলিশ

অফিসার, সবার মুখেই দেখা যেত মাস্ক। এছাড়া অসুস্থ মানুষদের তখনও আজকের মতোই কোয়ারানটাইনে রাখা হয়েছিল। আর কোয়ারানটাইনে থাকা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষদের একাকিত্ব ঘোচাতে—যেহেতু তখন সোশ্যাল মিডিয়া বা টিভি ছিল না, তাই ভরসা ছিল টেলিফোন। মানুষকে মাস্ক সম্পর্কে সচেতন করতে এবং কোয়ারানটাইনে থাকা মানুষদের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে টেলিফোনে কথাবার্তার বিজ্ঞাপন সেসময় ঘুরপাক খেত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বা বিজ্ঞাপনী প্রচারে।

এইচআইভি-এইডস সংকট

মহামারীর ধাক্কায় মানুষের জীবনকাল কমে যাওয়ার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৮০-এর দশকে এইচআইভি-এইডস সংকট। এই মহামারী গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোয় মানুষের গড় আয়ুষ্কালের ওপর এটির প্রভাব ছিল উল্লেখ করার মতো।[15] বেঁচে থাকার প্রবণতায় কয়েক দশক ধরে উন্নতির পথে থাকলেও এর জন্য তা

---

[15] সম্পাদকীয় টীকা: এইচআইভি/এইডস মহামারীর গড়-আয়ু-হ্রাসের প্রভাব মূলত পড়েছিল দক্ষিণ ও সাব-সাহারান আফ্রিকায়, উত্তর আফ্রিকায় নয়—প্রবন্ধে “উত্তর আফ্রিকা” একটি ভৌগোলিক স্খলন। সূত্র: Our World in Data / UNAIDS, https://ourworldindata.org/hiv-aids

উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এন্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি, চিকিৎসা এবং এই রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে গণসচেতনতা বিস্তার হওয়ার সাথে সাথে, বিশ্বব্যাপী এইডসের কারণে মৃত্যু মাত্র এক দশকের মধ্যেই হ্রাস পেয়েছে—প্রায় ২০ লাখ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১০ লাখে। তখন থেকেই দেশগুলো তাদের আয়ুষ্কালের চিত্র কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে। এখনো পর্যন্ত আফ্রিকার এইসকল অঞ্চলের গড় আয়ু ৫০-৫৫ বছরের মধ্যেই সীমিত!

অগ্রগতি ও পরিসংখ্যান

বিভিন্ন মহামারী আগেও গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। প্রতিরোধযোগ্য টিকাকরণের ফলে রোগে মৃত্যুর হারও কমে এসেছে। এছাড়া স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান, পুষ্টি, টিকা এবং মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭ সালে বিশ্বের প্রায় পাঁচ কোটি ৬০ লাখ মানুষ মারা যান। ১৯৯০ সালের তুলনায় এই সংখ্যা এক কোটিরও বেশি হলেও মৃত্যুর হার কম। তার কারণ অবশ্যই বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষ গড়ে বেশি সময় ধরে বাঁচছে।

লকডাউনে প্রকৃতির স্বস্তি

মহামারী রুখতে জারি হওয়া লকডাউনে মানুষ ঘরবন্দি থাকায় সুফল মিলেছে প্রকৃতিতে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড

স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) জানাচ্ছে, 'এই লকডাউনের ফলেই ভারতের বায়ুদূষণ একধাক্কায় অনেকটা কমে গেছে। গত ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম উত্তর ভারতের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে গঙ্গা অববাহিকায় বছরের এই সময় নাসার উপগ্রহ চিত্রে দেখা গেছে, লকডাউনের বাতাসে অ্যারোসোলের মাত্রা এতটাই নেমে গেছে যে তা একরকম ঐতিহাসিকই বলা চলে।' এই অ্যারোসোল হ'ল এমন ছোট ছোট শক্ত বা তরল কণা যা বাতাসের সঙ্গে মিশে দৃশ্যমানতা কমিয়ে দেয়। এটি বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকায় মানুষের ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রেরও ক্ষতি করে বলেই জানা যায়।

করোনা মোকাবিলায় লকডাউন পর্বের সময়ের সার্বিক পরিস্থিতিকে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, এই সময়সীমায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বায়ুদূষণের মাত্রা। বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের বাতাসে ভাসমান ক্ষতিকর কণার মাত্রা কমেছে ১০ শতাংশ এবং দিল্লিতে কমেছে ৫৪ শতাংশ। কলকাতাসহ অন্য তিনটি শহরে বায়ুদূষণ হ্রাসের মাত্রা ছিল ২৪ থেকে ৩২ শতাংশের মধ্যে। দীর্ঘ দিনের এই লকডাউন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আমাদের জীবনযাপন পৃথিবীর ওপর কী প্রভাব ফেলছে। পরিবহন ব্যবস্থা বিশ্বে ২৩ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ করে থাকে। এই নির্গমনের মাত্রা কমেছে

স্বল্পমেয়াদে জারি হওয়া লকডাউনে, যা কোভিড-১৯-এর দরুন জনস্বাস্থ্যের জন্য নেওয়া ব্যবস্থা। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে আরোপিত লকডাউনের সবচেয়ে বড় সুফল হয়েছে, সমগ্র পৃথিবীর সব মানুষ অনেকটাই দূষণমুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সমগ্র পৃথিবীতে শুধু শহরে বসবাসকারী শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ এমন বায়ুর সংস্পর্শে আসে, যা বায়ুপরিশুদ্ধতামানের নিরাপদ সীমার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর অবস্থা এক্ষেত্রে আরো খারাপ, যেখানে ৯৮ শতাংশ শহরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত সীমার মধ্যে বায়ুপরিশুদ্ধতামান রাখতে ব্যর্থ। ‘বোস্টনের স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার’-এর ২০১৫ সালের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ‘দূষণের কারণে ভারতের মানুষের মৃত্যুর হার বাংলাদেশের থেকে প্রায় ১৩ গুণ এবং পাকিস্তানের চেয়ে ২১ গুণ বেশি। পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর প্রায় ৯২ শতাংশ মানুষ দূষিত বাতাসের মধ্যে বসবাস করছে। সারা পৃথিবী জুড়েই বায়ুদূষণ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। গবেষকদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সালের পর থেকে ১৯৫টি দেশে প্রায় ৩০০ রোগের প্রকোপ বেড়েছে, যার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী বায়ুদূষণ।’

প্রকৃতির পুনর্জাগরণ

পৃথিবী জুড়ে মানব সভ্যতা যখন করোনাভাইরাসের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে—কবে প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আসবে—তখন প্রকৃতিই যেন ভারসাম্য রক্ষার আনন্দে মেতেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কমবেশি সব শহরই লকডাউনের কারণে মানুষের গৃহবন্দী হওয়ায় প্রাণীকুলও মেতে উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন প্রাণীর পদচারণার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখতে পারছি। এর অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই পৃথিবীতে নিত্যকার মানুষের কার্যক্রম এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দূষণের মাত্রা কমে যাওয়া।

নিউ নর্মালের পাঠ

পরিবেশ যে কতটা পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ হতে পারে, কোভিড-১৯-এর জন্য দীর্ঘ লকডাউন সেটা বোঝারও সুযোগ করে দিল জনগণকে। এই বোধ পরবর্তীতে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বড় ভূমিকা নিতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষার নীতি নির্ধারণেও বিশেষ বার্তা দিতে পারে। করোনা পরবর্তী বিশ্ব তথা দেশে কোনটা স্বাভাবিক তা আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে। লকডাউনে পরিবেশ সংক্রান্ত এই পাঠ অবশ্যই ভবিষ্যতে আলোচনা এবং বিতর্কের সুযোগ করে দেবে।

সাম্প্রতিককালের এই বায়ুপরিশুদ্ধতা মানের উন্নয়ন চিরস্থায়ী করতে গেলে জীবাশ্ম জ্বালানিকে পুননবীকরণযোগ্য শক্তি এবং অন্যান্য স্বল্প কার্বনযুক্ত শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে হবে। সারাদেশের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিঃসরণ মাত্রা (এমিশন স্ট্যান্ডার্ড) নির্ধারণের দাবির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা অধিকমাত্রায় গণপরিবহন চালুরও দাবি জানাচ্ছেন। এর অর্থ এই নয় যে প্রচুর পরিমাণে বাস কিনে সেগুলো গণপরিবহন বহরে যুক্ত করা। বরং যেটি করা উচিত তা হচ্ছে এমন ব্যবস্থা চালু করা যাতে নাগরিকরা ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে সেই সব গণপরিবহন ব্যবহার করতে শুরু করে। কারণ শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের জন্য ৭০ ভাগ দায়ী হচ্ছে এসব ব্যক্তিগত গাড়ি।

স্বল্প সময়ের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ কোভিড-১৯-এর মহামারীর কালো আকাশে এক চিলতে আলো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদের জন্য এটা আমাদের একটা বার্তা হতে পারে। পরিবেশ দূষণের কারণে সমগ্র পৃথিবীতে শুধু মানুষ যে মারা যাচ্ছে তা নয়, জন্ম নিচ্ছে নিত্যনতুন রোগব্যাধিরও। করোনার মতো ভাইরাসের আবির্ভাব হচ্ছে, যা মহামারী রূপে আক্রান্ত করছে কোটি কোটি মানুষকে; গভীর মৃত্যুর দিকে নীরবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, পিএম ২.৫, পিএম ১০ এবং ওজোন (O_3),

অ্যামোনিয়া-সহ নানা উপাদান বাতাসে স্বাভাবিক মাত্রা পার করলেই মানব শরীরের নানা ক্ষতিসাধন করে—অ্যালার্জি, ফুসফুসে ক্যানসার, হৃদরোগ, সিওপিডি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে লকডাউনের কারণে আপাতত কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে বাতাস। পরিবেশের জন্য তবে কি লকডাউন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দাবি হতে চলেছে?

মহামারীতে হারানো মনীষারা

যুগের পর যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে স্বাস্থ্য বিপর্যয়ে বা মহামারিতে। অনেক বিখ্যাত মনীষীও আক্রান্ত হয়েছেন এসব রোগে; অনেকেই ছিলেন গৃহবন্দি হয়ে। ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, হার্নেন কার্তেজ, লিও তলস্তয়, নিৎশে, বদল্যের, মোপাসাঁ, জার্মান কবি হেনরিক হাইনে, মুসোলিনি, হিটলার, লেনিন, বিখ্যাত ডাচ চিত্রকর রেমব্রান্ট, বাংলার শরৎচন্দ্র, রবিঠাকুর পর্যন্ত। সেই অস্বাভাবিক বিপর্যয়ের দিনগুলোতে তাঁদের রচনা বিশ্বসাহিত্যে অনন্য স্থান করে নিয়েছে।

আবার মহামারী বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে কেড়ে নিয়েছে অনেক বিখ্যাত প্রতিভাবান মনীষীকে। শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে “ননসেন্স ছড়া”র প্রবর্তক সুকুমার রায় তৎকালীন মহামারী কালাজ্বরে (লেইশ্মানিয়াসিস) আক্রান্ত

হন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এই বিরলতম প্রতিভার জীবনাবসান ঘটে।[16] শরীরে প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মাত্র ২১ বছর বয়সে আমরা হারিয়েছি। একইভাবে বিখ্যাত কবি জন কিটস যক্ষ্মায় মাত্র ২৫ বছর বয়সে মারা যান। বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীত যুগের বিখ্যাত অস্ট্রীয় সুরকার আমাডেউস মোৎসার্টের জীবনকাল ৩৫ বছর বয়সেই শেষ হয়ে যায়। ভারত তথা বিশ্বের হিন্দুধর্মের মহামানব, যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ‘সেরিব্রাল স্ট্রোক’ কারণ হতে পারে এই মহাপ্রয়াণের।

[16] সম্পাদকীয় টীকা: সুকুমার রায়ের জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭, মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩—অর্থাৎ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর, ৩৭ নয়। মৃত্যুর কারণ কালাজ্বর (visceral leishmaniasis)—যথাযথ। সূত্র: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Sukumar_Ray

অধ্যায় ৭ — লকডাউন: গ্লোবাল ওয়ার্মিং রোখার পথনির্দেশ

(মূল রচনা: ২০২০; এই অধ্যায়টি লেখকের একটি পৃথক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত)

উভয়সংকটের পৃথিবী

দুনিয়াজুড়ে করোনাভাইরাসের বিস্তার গোটা বিশ্বকে এক উভয়সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রথম সংকটটি জনস্বাস্থ্যের, দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক। জনস্বাস্থ্যের অসহায় দশা প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে মানবসভ্যতাকে; আর তার পরিণামে সংঘটিত লকডাউন কয়েক কোটি মানুষকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে আঘাত হেনেছে বিশ্বের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর।

এই দ্বিতীয় সংকটটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি নৈতিক দাবি, যা এড়িয়ে গেলে গোটা আলোচনাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যখন ঘরে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে, তখন তাদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান কোনো দয়া নয়—তা মানবসভ্যতার মৌলিক দাবি। যে রাষ্ট্র মানুষের চলাফেরার অধিকার কেড়ে নেয়, তার ওপরেই বর্তায় সেই মানুষের অন্নসংস্থানের দায়। বিশ্বজুড়ে চলা এই বিপর্যয়ের মোকাবিলায় স্থানীয় সরকারি ব্যবস্থা সেই দাবি কতটা পূরণ করতে পারল, ইতিহাস তার হিসেব চাইবে।

চিনের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে; কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে অনেক দেশই বেছে নিয়েছে লকডাউনের পথ। এই লেখাটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন বিশ্বের ১৮৫টি দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ৮২টি দেশ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে লকডাউন প্রয়োগ করেছে, এবং গোটা বিশ্ব মিলিয়ে তিন বিলিয়ন বা ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষ ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য

হয়েছেন।[17] কোথাও কোথাও এই বন্দিদশা টানা চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে।

এই লকডাউনে পুরো অর্থনীতি অচল হয়ে পড়েছে। বিমান, রেল-সহ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ থাকায় সরবরাহও থমকে গেছে, ফলে খাদ্য ব্যবস্থা

[17] সম্পাদকীয় টীকা: এই সংখ্যাগুলি সঠিক, তবে ২০২০ সালের একটি *নির্দিষ্ট মুহূর্তের*—আনুমানিক মার্চের শেষ থেকে এপ্রিল ২০২০। ২৪–২৬ মার্চ ২০২০-এ ভারত তার ১৩০ কোটি নাগরিককে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার পরই বিশ্বে লকডাউনে থাকা মানুষের সংখ্যা ৩০০ কোটি ছাড়ায়; একই সপ্তাহে জন্স হপকিন্স-এর হিসেবে আক্রান্ত দেশের সংখ্যা ছিল ১৮৫। উল্লেখ্য, অধ্যায় ৫-এ ব্যবহৃত ২১৭টি দেশ, ৯০টি লকডাউন ও ৩৫০ কোটি মানুষের সংখ্যাগুলি ২০২০ সালের অক্টোবরের—অর্থাৎ এই দুটি প্রবন্ধ ২০২০ সালের দুটি পৃথক পর্বে লেখা, এবং সংখ্যাগুলি পরস্পরবিরোধী নয়, ক্রমিক। একই কারণে “চার মাসেরও বেশি ঘরবন্দি” বাক্যটি মার্চ-এপ্রিলের প্রেক্ষিতে অগ্রিম অনুমান হিসেবেই পড়া উচিত। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তিন কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যুর সতর্কবাণীটি নিশ্চিত—ডেভিড বিসলি তা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে জানান ২১ এপ্রিল ২০২০-এ। সূত্র: World Economic Forum, https://www.weforum.org/stories/2020/03/todays-coronavirus-updates/ ; WFP, https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-

পড়েছে চরম অনিশ্চয়তায়। অধ্যায় ৫-এ যেমন দেখা গেছে, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সতর্কবাণী অনুযায়ী অর্থনীতি এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের অন্তত তিন কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারেন। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে কোটি কোটি মানুষের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ভাষায়, কোভিড-১৯ সম্ভবত কোটি কোটি মানুষের জন্য একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

অথচ ঠিক এই দমবন্ধ ছবিটির পাশেই ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি ছবি। মানুষ ঘরবন্দি থাকায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে প্রকৃতি। এই অধ্যায়ের বিষয় সেই দ্বিতীয় ছবিটি—এবং তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য কী পাঠ নেওয়া যায়, সেই প্রশ্ন।

---

hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council

২৫ মার্চ: একটি দেশের নিঃশ্বাস

করোনা সংক্রমণ কমাতে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ থেকে সারা ভারত লকডাউনের আওতায় আসে।[18] প্রায় আড়াই মাস ধরে চলা এই ঘরবন্দি দশার সুফল সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মিলেছে প্রকৃতিতে।

অধ্যায় ৬-এ নাসার (NASA) উপগ্রহচিত্রের কথা বিস্তারিতভাবে এসেছে—গত কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম উত্তর ভারতের বায়ুমণ্ডলে, বিশেষত গঙ্গা অববাহিকায়, অ্যারোসোলের মাত্রা এতটা নেমে যাওয়া, যা একরকম ঐতিহাসিকই বলা চলে। এখানে সেই পরিসংখ্যান পুনরাবৃত্তি না করে বরং একটি ভিন্ন প্রশ্ন তোলা যাক: এই হ্রাস কি শুধু ভারতেরই ঘটনা, না কি এর কোনো বৈশ্বিক তুলনা আছে?

---

[18] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ মার্চ ২০২০-এর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে সম্পূর্ণ দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেন, যা মধ্যরাত থেকে—অর্থাৎ ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে—কার্যকর হয় এবং প্রাথমিকভাবে ২১ দিনের জন্য ধার্য ছিল। পরে দফায় দফায় বাড়িয়ে তা ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত চলে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাস—প্রবন্ধের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সূত্র: PMO India, https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-calls-for-complete-lockdown-of-entire-nation-for-21-days/

পাঁচ শহর, দুই মহাদেশ

উত্তরটি এসেছে *সাসটেনেবল সিটিজ অ্যান্ড সোসাইটি* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে। লকডাউন পর্বের বায়ুদূষণকে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করে গবেষকরা দেখিয়েছেন, ভারতের পাঁচটি বড় শহরে ভাসমান ক্ষতিকর কণার (PM2.5) মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে— মুম্বইয়ে ১০ শতাংশ, দিল্লিতে ৫৪ শতাংশ, কলকাতা-সহ বাকি তিনটি শহরে ২৪ থেকে ৩২ শতাংশের মধ্যে (এই সংখ্যাগুলি অধ্যায় ৬-এ আলোচিত হয়েছে)।

কিন্তু এই সমীক্ষার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অংশটি ভারতের বাইরের। গবেষকরা ভারতীয় শহরগুলির এই দূষণ-হ্রাসকে পাশাপাশি রেখেছেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা (৬০ শতাংশ) এবং চীনের সাংহাই (৪২ শতাংশ)-এর সঙ্গে।[19] অর্থাৎ ঘটনাটি ভারত-নির্দিষ্ট কোনো আকস্মিকতা নয়। মধ্য

---

[19] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। সমীক্ষাটি প্রশান্ত কুমার ও সহ-গবেষকদের “Temporary reduction in fine particulate matter due to ‘anthropogenic emissions switch-off’ during COVID-19 lockdown in Indian cities”, প্রকাশিত *Sustainable Cities and Society* (২০২০)-এ, ইউনিভার্সিটি অফ সারে-র Global Centre for Clean Air Research থেকে। শহর পাঁচটি চেন্নাই, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা ও মুম্বই; তুলনার ভিত্তি পূর্ববর্তী

ইউরোপের একটি ধনী শহর, পূর্ব এশিয়ার একটি বিশাল শিল্পনগরী এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাজধানী—তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনীতি, ভিন্ন জলবায়ু, ভিন্ন দূষণ-উৎস—সবাই একই দিকে সাড়া দিয়েছে যখন একই কারণ, অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এটাই এই আড়াই মাসের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। প্রায় আড়াই মাসের এই লকডাউন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আমাদের জীবনযাপন পৃথিবীর ওপর ঠিক কী প্রভাব ফেলছে। বায়ুদূষণ কোনো অমোঘ নিয়তি নয়; এটি আমাদের নিজস্ব অভ্যাসের সরাসরি ফল, এবং অভ্যাস বদলালে তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বদলে যায়।

পাঁচ বছরের একই সময়কাল; এবং ভিয়েনার ~৬০% ও সাংহাইয়ের ~৪২% হ্রাসের সঙ্গে তুলনাটি গবেষকদেরই করা। প্রবন্ধে উল্লেখ না থাকলেও একই সমীক্ষার আরেকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য: এই স্বল্পস্থায়ী পরিচ্ছন্ন বাতাস ভারতে আনুমানিক ৬৩০টি অকাল মৃত্যু এবং প্রায় ৬৯ কোটি মার্কিন ডলারের স্বাস্থ্যব্যয় এড়িয়ে দিয়ে থাকতে পারে। সূত্র: ScienceDaily, https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200716101621.htm ; Phys.org, https://phys.org/news/2020-07-covid-lockdown-dangerous-air-pollutants.html

নিউ ইয়র্কের আকাশ, চীনের কারখানা

সমুদ্রপারে ছবিটা একই। নাসার তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের মার্চ মাসে নিউ ইয়র্ক-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলিতে দূষণের মাত্রা আগের পাঁচ বছরের গড়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম ছিল।[20]

---

[20] সম্পাদকীয় টীকা: **সংশোধন।** মূল প্রবন্ধে এই ৩০ শতাংশ হ্রাসকে *কার্বন ডাই-অক্সাইড* (CO_2) দূষণের হ্রাস বলা হয়েছিল। নাসার ১৩ এপ্রিল ২০২০-এর প্রকাশিত তথ্যে সংখ্যাটি আসলে *নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড* (NO_2)-এর—"nitrogen dioxide levels are down about 30% over major metropolitan areas including Washington, DC, New York City, Philadelphia and Boston"—Aura উপগ্রহের Ozone Monitoring Instrument-এর মাপে, ২০১৫–১৯ সালের মার্চ মাসের গড়ের সাপেক্ষে। পার্থক্যটি নিছক নামের নয়। NO_2 কয়েক ঘণ্টা আয়ুর দহনজাত দূষক, তাই লকডাউনে কয়েক দিনেই তা ধসে পড়ে; CO_2 শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস, এবং ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী নিঃসরণ ~৬–৭% কমা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর ঘনত্ব বেড়েই চলেছিল—২০২০ সালের মে মাসে মাউনা লোয়া নতুন রেকর্ড ছোঁয়। সংশোধিত পাঠটি বরং প্রবন্ধের যুক্তিকে আরও ধারালো করে: লকডাউন প্রমাণ করেছে *স্থানীয় বায়ুদূষণ* প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, কিন্তু *গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব* নড়ে না—যে কারণে বিক্ষিপ্ত লকডাউন নয়,

আর যদি নিঃসরণের উৎসের দিকে তাকানো যায়, তবে সবচেয়ে বড় নামটি এশিয়ারই। চীন একাই এশিয়ার সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ৫০ শতাংশেরও বেশি নির্গত করে—মহামারির সময়ে যার একটি বড় অংশ কয়েক মাসের জন্য নির্গত হয়নি। গোটা চীন জুড়ে কমবেশি ১০ শতাংশ CO_2 নির্গমন হ্রাস পাওয়া মানে বিপুল সংখ্যক গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার সমতুল্য।[21]

কাঠামোগত পরিবর্তনই একমাত্র পথ। সূত্র: NASA / Space.com, https://www.space.com/nasa-satellite-air-pollution-us-northeast-coronavirus.html ; NOAA Global Monitoring Laboratory, https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

[21] সম্পাদকীয় টীকা: **সংশোধন।** চীন এশিয়ার মোট CO_2 নিঃসরণের ৫০ শতাংশেরও বেশির জন্য দায়ী—এটি নিশ্চিত (চীনের বার্ষিক নিঃসরণ ~১০০০ কোটি টন, এশিয়ার মোট ~১৯০০–২০০০ কোটি টন)। কিন্তু মূল প্রবন্ধের “১০ শতাংশ হ্রাস মানে প্রায় ৪৮,০০০ গাড়ি রাস্তায় না নামানোর সমতুল্য” হিসেবটি বিপুল ব্যবধানে ভুল। চীনের নিঃসরণের ১০ শতাংশ মানে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টন CO_2; একটি সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি বছরে ছাড়ে ~৪.৬ টন। ভাগ করলে দাঁড়ায় প্রায় **২২ কোটি গাড়ি**—৪৮,০০০-এর প্রায় ৪,৬০০ গুণ। উল্টো দিক থেকে দেখলে, ৪৮,০০০ গাড়ির বার্ষিক নিঃসরণ চীনের মোট নিঃসরণের প্রায় ০.০০২ শতাংশ। সংখ্যাটির কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া

এই সব হ্রাসের পেছনে প্রধান কারণ পরিবহন। অধ্যায় ৬-এ উল্লিখিত হয়েছে, পরিবহন ব্যবস্থা বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের প্রায় ২৩ শতাংশের জন্য দায়ী। সেই পরিবহন-নিঃসরণের ভেতরে ঢুকলে দেখা যায়, মূল অবদানকারী হলো গাড়ি চালনা (৭২%) এবং বিমান চালনা (১১%)।[22] অর্থাৎ যে দুটি কাজ

যায়নি; সম্ভবত এটি কোনো একক শহর বা কারখানা-সংক্রান্ত হিসেবের বিকৃত রূপ। মূল পাঠে সংখ্যাটি বাদ দিয়ে “বিপুল সংখ্যক গাড়ি” রাখা হয়েছে। সূত্র: Our World in Data, https://ourworldindata.org/annual-co2-emissions ; US EPA, https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle

[22] সম্পাদকীয় টীকা: **হর-সংক্রান্ত সংশোধন।** ৭২% ও ১১% সংখ্যা দুটি সঠিক, কিন্তু এগুলি *সমস্ত গ্রিনহাউস গ্যাসের* ভাগ নয়—এগুলি *পরিবহন-জনিত* নিঃসরণের অভ্যন্তরীণ ভাগ। বৈশ্বিক হিসেবে (Our World in Data, ২০১৮ উপাত্ত) পরিবহন-নিঃসরণের ~৭৫% সড়ক পরিবহন (যাত্রীবাহী যান ৪৫.১% + পণ্যবাহী ২৯.৪%), বিমান চালনা ১১.৬%, জাহাজ ১০.৬%, রেল ১%; ইউরোপীয় পার্লামেন্টের হিসেবে সড়ক পরিবহন পরিবহন-নিঃসরণের ৭১.৭%। যেহেতু পরিবহন গোটা বিশ্বের CO_2-র ~২১–২৪%, তাই সড়ক পরিবহন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের মোট CO_2-র ~১৫% এবং বিমান চালনা ~২.৫%।

আধুনিক জীবনের সবচেয়ে স্বাভাবিক অংশ বলে আমরা ধরে নিই—রোজ গাড়ি নিয়ে বেরোনো আর প্লেনে চড়া—সেই দুটিই পরিবহনজনিত উষ্ণায়নের সিংহভাগের উৎস। লকডাউনে ঠিক এই দুটিই থেমে গিয়েছিল, এবং ফলাফল উপগ্রহ থেকে দেখা গিয়েছিল।

তবে একটি সতর্কতা এখানে জরুরি। এই হ্রাস ঘটেছে স্বল্পমেয়াদে, এবং কেবল সেসব দেশে, যাদের কোভিড-১৯-এর দরুন জনস্বাস্থ্যের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এটি নীতির ফল নয়, দুর্ঘটনার ফল। দুর্ঘটনা মিটে গেলে ছবিটি ফিরে আসতে বাধ্য—যদি না আমরা সচেতনভাবে কিছু বদলাই।

যে দূষণ চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায়

বিশ্বের প্রায় সব বড় শহরে বায়ুদূষণের পাশাপাশি—এবং পর্যটন-শহরগুলিতে তার চেয়েও তীব্রভাবে—রয়েছে আরেকটি সমস্যা, যা পরিসংখ্যানে কম ওঠে:

মূল পাঠে তাই বাক্যটিকে “পরিবহন-নিঃসরণের ভেতরে” এই কাঠামোয় স্থাপন করা হয়েছে। সূত্র: Our World in Data, https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport ; European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics

শব্দদূষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী গোটা ইউরোপ জুড়ে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ শব্দদূষণের কারণে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন।[23]

শব্দদূষণ যে শুধু মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করে তাই নয়, এটি অন্য প্রাণীকুলের জন্যেও রীতিমতো মৃত্যুফাঁদ। যে তিমি বা ডলফিন শব্দতরঙ্গের সাহায্যে পথ চেনে, জাহাজের একটানা গর্জন তার কাছে অন্ধত্বের সমান। যে পাখি ডাক দিয়ে সঙ্গী খোঁজে, ট্র্যাফিকের শব্দ তার বংশবিস্তারের সম্ভাবনাই

---

[23] সম্পাদকীয় টীকা: তথ্যটি নিশ্চিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইউরোপীয় আঞ্চলিক দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ইউরোপে প্রতি পাঁচজনে একজন—প্রায় ১০ কোটি মানুষ—সড়ক-যানবাহনের অস্বাস্থ্যকর মাত্রার শব্দের সংস্পর্শে আসেন। ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার হিসেবও একই মাত্রার (~১১ কোটি ৩০ লক্ষ), এবং তাদের মতে পরিবেশগত শব্দদূষণ ইউরোপে বছরে আনুমানিক ১২,০০০ অকাল মৃত্যু ও ৪৮,০০০ নতুন হৃদরোগের ঘটনায় অবদান রাখে। সূত্র: WHO Europe, https://www.who.int/europe/news/item/04-08-2024-how-much-does-environmental-noise-affect-our-health–who-updates-methods-to-assess-health-risks ; European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/health-risks-caused-by-environmental-noise-in-europe

কমিয়ে দেয়। লকডাউনে পৃথিবী কয়েক মাসের জন্য চুপ করে গিয়েছিল—আর সেই নীরবতার সুফল সবচেয়ে বেশি পেয়েছিল মানুষ ছাড়া বাকিরা।

জলের নিচে, জলের ওপরে

স্থলভাগের মতোই বদল এসেছে জলজ পরিবেশেও। নৌযানগুলির বেশির ভাগ বন্ধ থাকায় জলদূষণ প্রায় নেই বললেই চলে; জল স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। নৌযানের উপস্থিতি কমে যাওয়ায় একদিকে বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ তীরবর্তী হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের শিকার করতে ডলফিনগুলিও সৈকতের পার্শ্ববর্তী হচ্ছে এবং নিরিবিলি পরিবেশ পেয়ে আপন খেলায় মেতে উঠছে।[24]

---

[24] সম্পাদকীয় টীকা: প্রক্রিয়াটি বাস্তব, কিন্তু প্রমাণের উৎস নিয়ে সতর্কতা দরকার। ২০২০ সালের বসন্তে বিশ্বজুড়ে জাহাজ ও প্রমোদতরী চলাচল ব্যাপকভাবে কমে যায়; থমসন ও বার্কলে-র মাপে (*Journal of the Acoustical Society of America*, ২০২০) ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের উপকূলে সমুদ্রের নিম্নকম্পাঙ্কের শব্দ প্রায় ১.৫ ডেসিবেল কমে যায়, এবং নৌচলাচল কমায় পলি থিতিয়ে জল স্বচ্ছ হওয়ার ঘটনা একাধিক জায়গায় নথিভুক্ত। ডলফিন উপকূলের কাছে আসার প্রকৃত ঘটনাও ঘটেছে (যেমন বসফরাস প্রণালী ও কোচি উপকূলে)। তবে সেই সময়ে সামাজিক মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ছড়ানো ভিডিওগুলি—বিশেষত “ভেনিসের খালে ডলফিন” ও “ভেনিসে রাজহাঁস

স্থলভাগে যে ছবি অধ্যায় ৬-এ এসেছে—জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ানো হরিণ, নীলগাই, চিতাবাঘ—জলেও তার প্রতিচ্ছবি। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, পৃথিবী শুধু মানুষের নয়; কয়েক লক্ষ প্রজাতির জীবকুলও এই পৃথিবীরই আধার। প্রকৃতিকে ধ্বংসের চেষ্টা করলে প্রকৃতি প্রতিরোধ গড়ে তোলে তার নিজস্ব কায়দায়, আর সেখানে অসহায় হয়ে পড়ে গোটা মানবসভ্যতা।

দূষণমুক্ত বাতাসের দাম

লকডাউনের সবচেয়ে বড় সুফল—পৃথিবীর মানুষ কিছুদিনের জন্য তুলনামূলক দূষণমুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে—তার মূল্য বোঝা যায় স্বাভাবিক সময়ের মৃত্যুর হিসেব দেখলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি বহুল-উদ্ধৃত হিসেব

ফিরেছে”—যাচাইয়ে ভুল প্রমাণিত হয়েছে; ডলফিনের ভিডিওটি ছিল শত শত কিলোমিটার দূরে সার্ডিনিয়ার একটি বন্দরের, আর রাজহাঁসগুলি ছিল বুরানো দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা। ভেনিসের জল সত্যিই স্বচ্ছ হয়েছিল, কিন্তু তার কারণ দূষণ হ্রাস নয়, নৌকা কমায় পলি থিতিয়ে যাওয়া। সূত্র: National Geographic, https://www.nationalgeographic.com/animals/article/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-media-posts ; JASA, https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/147/5/3390/1058356

অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ বায়ুদূষণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[25] অধ্যায় ৬-এ যেমন দেখা গেছে, শহরে বসবাসকারী ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ নিরাপদ সীমার বাইরের বাতাসে শ্বাস নেন, আর

---

[25] সম্পাদকীয় টীকা: সংখ্যাটির অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা দরকার, কারণ অধ্যায় ৪ ও ৫-এ এই বইয়েই বায়ুদূষণজনিত বার্ষিক মৃত্যুর হিসেব দেওয়া হয়েছে ৮৮ লক্ষ (৮.৮ মিলিয়ন)। দুটি সংখ্যাই যথাস্থানে সঠিক, কিন্তু সংজ্ঞা ও সময়কাল আলাদা। ৩০ লক্ষ (৩ মিলিয়ন) হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর বিবৃতির সংখ্যা এবং তা কেবল *বাইরের বায়ুদূষণ* (ambient) সংক্রান্ত, ২০১২ সালের উপাত্তভিত্তিক। একই বিবৃতিতে ঘরের ভেতরের ও বাইরের দূষণ মিলিয়ে সংখ্যাটি ৬৫ লক্ষ; ২০১৪ সাল থেকে WHO-র প্রচলিত সামগ্রিক হিসেব ৭০ লক্ষ; আর এই বইয়ে ব্যবহৃত ৮৮ লক্ষ সংখ্যাটি Lelieveld et al., *Cardiovascular Research* (২০২০)-এর, যা অকাল মৃত্যুর বিস্তৃততর সংজ্ঞা ব্যবহার করে। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ সংখ্যাটি পুরোনো ও সংকীর্ণতর—আধুনিক পাঠকের জন্য ৮৮ লক্ষই অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক। সূত্র: WHO, https://www.who.int/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact ; Our World in Data, https://ourworldindata.org/data-review-air-pollution-deaths

অনুন্নত দেশগুলির ৯৮ শতাংশ শহরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মান রাখতে ব্যর্থ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, পিএম ২.৫, পিএম ১০, ওজোন (O_3) ও অ্যামোনিয়া-সহ নানা উপাদান বাতাসে স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়ালেই অ্যালার্জি, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদরোগ, সিওপিডি, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। পরিবেশদূষণে শুধু যে মানুষ মারা যাচ্ছে তা-ই নয়, জন্ম নিচ্ছে নিত্যনতুন রোগব্যাধিও—যার একটির নামই কোভিড-১৯।

প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ কি অভ্যাসে পরিণত হবে?

পরিবেশ যে কতটা পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ হতে পারে, কোভিড-১৯-এর দীর্ঘ লকডাউন সেটা বোঝার সুযোগ করে দিল জনগণকে। এই বোধ পরবর্তীকালে পরিবেশ রক্ষার নীতি নির্ধারণে বিশেষ বার্তা দিতে পারে। করোনা-পরবর্তী বিশ্বে কোনটা 'স্বাভাবিক', তা আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে।

তবে ভুল উপসংহারে পৌঁছনোও সহজ। সাম্প্রতিক এই বায়ুপরিশুদ্ধতার উন্নয়ন চিরস্থায়ী করতে গেলে বারবার লকডাউন নয়, প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন—জীবাশ্ম জ্বালানিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য ও স্বল্প-কার্বন শক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। স্বল্প সময়ের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ কোভিড-১৯-এর

কালো আকাশে এক চিলতে আলো হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি আমাদের কাছে একটি বার্তা—একটি পরীক্ষামূলক প্রমাণ যে পরিবর্তন সম্ভব, এবং তার ফল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যমান।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে রুখবার জন্যই প্রকৃতি যেন লকডাউনের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে ভারসাম্য রক্ষার এক রক্ষাকবচ। প্রশ্নটি তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের দিকেই ফিরে আসে—ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে বাঁচাতে মানুষ্যপ্রজাতি প্রকৃতির এই প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জকে অভ্যাসে পরিণত করতে প্রস্তুত কি?

উপসংহার

বিশ্বজুড়ে চলা মারণ করোনাভাইরাস আর বায়ুদূষণের যৌথ মহামারীর ধাক্কায় মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল কতটা অবনমন ঘটবে, তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে। এই মহামারীদ্বয়ের দাপটে নব্য-স্বাভাবিক (নিউ নর্মাল) পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি কতটা হয়, গবেষকদের ভবিষ্যৎ গবেষণায় জানা যাবে।

পরিশেষে যেটা বলা যায়, মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্যই ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাইবো, সেটাই স্বাভাবিক। তবে জীবনকে উপভোগ্য করার পাশাপাশি সুস্থ-সুন্দরভাবে সুদীর্ঘ কাল বেঁচে থাকার জন্য চাই সুপরিকল্পিত সার্বিক স্বাস্থ্যপরিষেবা সঙ্গে মহামারী-নিয়ন্ত্রিত জীবন। বর্তমানে 'অসুররূপী' দূষণ পৃথিবীর প্রাণশক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করছে।

"যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

জীবনের এই অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দোষারোপ করার জন্যও সূর্যের আলো পর্যন্ত দেখতে পাবে না!

পরিশিষ্ট — তথ্য-যাচাই টীকা প্রসঙ্গে

এই প্রবন্ধটি ২০২০ সালে রচিত—তার প্রতিটি পরিসংখ্যান, প্রতিবেদন, ক্রম ও তারিখ সেই সময়ের তথ্য ও পরিস্থিতির প্রতিফলন। ২০২৬ সালে এই সংস্করণ তৈরির সময় লেখাটির উল্লেখযোগ্য দাবিগুলিকে স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে WHO, UNDP, University of Chicago (AQLI), The Lancet, IHME, NASA, State of Global Air, Our World in Data প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে।

সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধের প্রধান পরিসংখ্যানগুলি যাচাইয়ে টিকে গেছে—বিশ্বব্যাপী বছরে প্রায় ৮৮ লক্ষ বায়ুদূষণ-মৃত্যু, ভারতে ১২.৪ লক্ষ (২০১৭, Lancet) ও ১৬,৬৭,০০০ (State of Global Air), সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে সাত বছর আয়ুক্ষয় (AQLI), কানপুরকে দূষিততম শহর হিসেবে চিহ্নিতকরণ (WHO), জি জিনপিং-এর ২০৩০/২০৬০ কার্বন-প্রতিশ্রুতি, এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত WHO-র ঘোষণার তারিখ (৩০ জানুয়ারি ও ১১ মার্চ ২০২০)—এসবই সমর্থিত হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে, যেগুলি মূল লেখা অক্ষুণ্ণ রেখে সংশ্লিষ্ট স্থানে সম্পাদকীয় পাদটীকায় নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করা

হয়েছে—যেমন ১৯১৮ স্প্যানিশ ফ্লুর মৃত্যুসংখ্যা, ইউএনডিপি ২০১৯-এর ক্রম, PLOS One গবেষণার ব্যাখ্যা, সুকুমার রায়ের মৃত্যুকালীন বয়স, ২০২০-এর বিশ্ব জনসংখ্যা, এইচআইভি/এইডসের আঞ্চলিক প্রভাব প্রভৃতি। কয়েকটি অতি-নির্দিষ্ট দশমিক সংখ্যা (মাথাপিছু কার্বনের মান, শহরওয়ারি দূষণ-হ্রাসের শতাংশ ইত্যাদি) প্রকৃত প্রতিবেদন থেকে এলেও মূল টেবিলের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্ক পৃথকভাবে মেলানো এই যাচাইয়ের পরিসরে সম্ভব হয়নি। পাঠক অনুগ্রহ করে লেখাটিকে ২০২০ সালের প্রেক্ষাপটে পাঠ করবেন।

তথ্যসূত্র

লেখকের মূল ঋণস্বীকার (২০২০): ১) বিবিসি নিউজ, ২) স্ট্যানফোর্ড ম্যাগাজিন, ৩) উইকিপিডিয়া, ৪) NIEHS ওয়েবসাইট, ৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মেডিসিন লাইব্রেরি (NCBI)-র তথ্য এবং ৬) বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদ।

সম্পাদকীয় তথ্য-যাচাই সূত্র (২০২৬):

1. Our World in Data — Life Expectancy: https://ourworldindata.org/life-expectancy-globally
2. Our World in Data — Spanish Flu: https://ourworldindata.org/spanish-flu-largest-influenza-pandemic-in-history
3. Worldometers — World Population by Year: https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/
4. UNDP — Human Development Report 2019 (India): https://india.un.org/en/163171-india-makes-modest-progress-2019-human-development-report

5. CDPP — India ranks 129 of 189 on HDI (HDR 2019): https://www.cdpp.co.in/articles/india-ranks-at-129-among-189-countries-on-hdi-un-human-development-report-2019
6. database.earth — Life Expectancy 2019: https://database.earth/population/life-expectancy/2019
7. WHO–UNICEF–Lancet Commission, “A Future for the World’s Children?” (2020): https://www.who.int/news/item/19-02-2020-world-failing-to-provide-children-with-a-healthy-life-and-a-climate-fit-for-their-future-who-unicef-lancet
8. The Lancet — WHO–UNICEF–Lancet Commission report: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext
9. Climate Home News — Xi Jinping 2030 peak / 2060 carbon neutrality: https://www.climatechangenews.com/2020/09/22/xi-jinping-china-will-achieve-carbon-neutrality-2060/
10. Openwaterpedia — Ganges / Pollution of the Ganga: https://openwaterpedia.com/wiki/Ganges
11. EPIC, University of Chicago — Air Quality Life Index (7-year loss, Indo-Gangetic plain):

https://epic.uchicago.edu/news/bad-air-cutting-lives-short-by-7-years-in-hindi-heartland-study

12. Down To Earth — Indo-Gangetic residents live 7 years less: https://www.downtoearth.org.in/news/air/indo-gangetic-plain-residents-live-7-years-less-than-other-indians-study-67522
13. Health Policy Watch — Delhi world’s most polluted capital: https://healthpolicy-watch.news/indias-air-quality-index-improves-but-delhi-remains-worlds-worst-polluted-city/
14. The Lancet Planetary Health — India air-pollution deaths 2017: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30261-4/fulltext
15. Al Jazeera — India’s polluted air killed 1.24 million in 2017: https://www.aljazeera.com/news/2018/12/6/indias-polluted-air-killed-1-24-million-in-2017-study
16. IHME / Our World in Data — Causes of Death (Global Burden of Disease): https://ourworldindata.org/causes-of-death
17. CSE India — 13 of 20 most polluted cities in India (WHO 2014): https://www.cseindia.org/who-says-india-ranks-

among-the-worlds-worst-for-its-polluted-air-out-of-the-20-most-polluted-cities-in-the-world-13-are-in-india-5402

18. BBC News — Kanpur world's most polluted city (WHO): https://feeds.bbci.co.uk/news/world-asia-india-43972155
19. Cardiovascular Research (Lelieveld et al., 2020) via ScienceDaily — air pollution as a "pandemic," 8.8 M deaths, 5.5 M saveable: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200302200734.htm
20. Newsweek — Air pollution vs malaria (19×) and AIDS (9×): https://www.newsweek.com/air-pollution-pandemic-smoking-malaria-1490046
21. PLOS One — Assessing the potential impact of COVID-19 on life expectancy (2020): https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238678
22. Worldometers — COVID-19 global figures / WHO declarations: https://www.worldometers.info/coronavirus/
23. Worldometers — COVID-19 India: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/

24. NASA Earth Observatory — Airborne particle levels plummet in northern India: https://earthobservatory.nasa.gov/images/146596/airborne-particle-levels-plummet-in-northern-india
25. State of Global Air / The Lancet Planetary Health — India 1.67 million air-pollution deaths: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30298-9/fulltext
26. Stanford University — 1918 influenza and U.S. life expectancy: https://virus.stanford.edu/uda/
27. Wikipedia — Sukumar Ray: https://en.wikipedia.org/wiki/Sukumar_Ray

যৌথ মহামারী

২০২০ সাল। একদিকে কোভিড-১৯ মহামারী, অন্যদিকে বছরের পর বছর ধরে চলা বায়ুদূষণের নীরব মহামারী। এই দুই মহামারীর যৌথ আঘাতে মানুষের গড় আয়ু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে — সেই প্রশ্ন থেকেই এই বইয়ের জন্ম। অমরত্বের প্রাচীন স্বপ্ন থেকে শুরু করে গড় আয়ুর দুই শতাব্দীর ইতিহাস, কার্বন নিঃসরণের বিশ্ব-ভূগোল, গঙ্গা-উপত্যকার বিষাক্ত বাতাস, স্প্যানিশ ফ্লু থেকে কোভিড, এবং লকডাউনের অপ্রত্যাশিত পরিবেশ-শিক্ষা — সাতটি অধ্যায়ে ধরা পড়েছে এক আন্তঃসংযুক্ত সংকটের ছবি। এই সংস্করণে মূল রচনা অবিকৃত রেখে যুক্ত হয়েছে স্বাধীন তথ্য-যাচাই টীকা, রঙিন তথ্যচিত্র ও সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র।

৮৮ লক্ষ	**৭ বছর**	**৪৮ কোটি**
বায়ুদূষণে বিশ্বে বার্ষিক অকালমৃত্যু	সিন্ধু-গাঙ্গেয় বলয়ে সম্ভাব্য আয়ু-হ্রাস	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা

> *"বর্তমানে 'অসুররূপী' দূষণ পৃথিবীর প্রাণ শক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করছে।"*

এই বইয়ে

- অমরত্বের স্বপ্ন থেকে গড় আয়ুর ইতিহাস
- গড় আয়ু ও কার্বনের বিশ্ব-ভূগোল
- গঙ্গা ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় বায়ু-সংকট
- বায়ুদূষণ: এক নীরব মহামারী
- কোভিড-১৯ ও যুগ্ম মহামারী
- ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও নিউ নর্মাল
- লকডাউন: গ্লোবাল ওয়ার্মিং রোখার পথনির্দেশ

অনাবিল সেনগুপ্ত — সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞান-লেখক ও যুক্তিবাদী কর্মী। আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, গণশক্তি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-সহ বাংলার প্রধান দৈনিকগুলিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।